# টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গোল - ৩
## এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাদক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনার

**আয়োজনেঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন**

**৩০ জুন ২০১৮, শনিবার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অডিটরিয়াম**

টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিশ্বে উন্নয়ণের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে দেখা হয়। বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়ণের জন্য এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি প্রণয়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার থেকে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল (এমডিজি) থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড় ও বহুমাত্রিক। ২০১৬ সালের জানুয়ারী থেকে এসডিজির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ এসডিজি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে দারিদ্র, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গ বৈষম্য নিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এসব ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এসডিজি বাস্তবায়নের সময় ১৫ বছর নির্ধারন করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যা অর্জন করতে চাই, তা এ সময়ের মধ্যে অর্জন করতে হবে। এসডিজির বিষয়গুলো ইতোমধ্যে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করেছে।

এসডিজির প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, শিক্ষা, টেকসই নগরায়ন, সমুদ্র ও বনভূমি রক্ষা ইত্যাদি। এগুলো সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে পূরণ করবে বলে এসডিজি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে।

**আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে লক্ষ্যমাত্রা–৩ অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণ এবং সকল বয়সী সকল মানুষের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।**

আগামী ১৫ বছর গোল-৩ এর আওতায় যে বিষয় গুলো বাস্তবায়িত হবে তা হলো মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা, দেশে ম্যালেরিয়া, যক্ষাসহ বেশ কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, এইডস্ প্রতিরোধে কর্মসূচী আরও জোরদার করা, সড়ক দূর্ঘটনাজনিত হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম, তামাক, মাদকদ্রব্য ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি।

**আজকের এই সেমিনারে আলোচনার বিষয়বস্তু লক্ষ্যমাত্রা–৩ এর ১৩টি টার্গেটের মধ্যে টার্গেট ৩.৫ অর্থাৎ মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস ও চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর।**

প্রথমে আমি আলোচনা করতে চাই বাংলাদেশে মাদকের ভয়াবহতা ও ব্যবহার নিয়ে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক চক্রের অবৈধ মাদক বাণিজ্যের কালো থাবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশকে মাদকের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। ইউরোপীয় দেশ সমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাদকাসক্তদের চাহিদা মেটানোর জন্য আর্ন্তজাতিক মাদক চোরাকারবারিরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। পত্রিকার রির্পোট অনুযায়ী দেশজুড়ে সাড়ে তিন লাখ মানুষ নানাভাবে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নারী ও শিশু-কিশোররাও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। মাদকাসক্তির কারণে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বিপথগামী হচ্ছে এবং তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এতে করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অনুমান করা হয় বর্তমানে দেশে মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা কমপক্ষে ৭০ লাখ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতিদিন দেশে নেশাদ্রব্যের পেছনে যে অপচয় হচ্ছে তা মোট জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশের বেশি। দেশে অপ্রত্যাশিত ভাবে ইয়াবার ব্যবহার বৃদ্ধিপাওয়ার কারনে মাদক গ্রহণের খরচ অনেক গুন বেড়ে গেছে। কারন অন্যান্য মাদকের চেয়ে ইয়াবার দাম বেশি।

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০৫ সালে একজন মাদকাসক্তের দৈনিক নেশার খরচ ছিল গড়ে প্রায় ১৫০ টাকা। গত ৭/৮ বছরে মাদকদ্রব্যের তালিকায় নতুন নতুন দামী মাদক যোগ হয়েছে। সহজলভ্যতা, বেকারত্ব বৃদ্ধি, কালো টাকার আধিক্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদি কারণে মাদকাসক্তের মিছিল দিন দিন দীর্ঘ

থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের প্রতি মারাত্মক নির্ভরশীলতা ব্যক্তি জীবনে যেমন সর্বনাশ করছে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিকে স্থবির করে দিচ্ছে, বিঘ্ন করছে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, মুদ্রা ব্যবস্থা (মুদ্রা চোরাচালান)।

**মাদক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগঃ** মাদকদ্রব্য চোরাচালানি ও অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সরকার ১৯৯০ সালে আইন প্রণয়ন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করেছেন। জেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তর অফিস রয়েছে। সাথে সাথে সীমিত আকারে চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং তৎপরতায় বর্তমানে বেশ জোরদার ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অধিদপ্তর থেকে বেসরকারী চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এপর্যন্ত ২৩৪ টি বেসরকারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্রকে অধিদপ্তর লাইসেন্স দিয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়া সরকারের অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

<u>ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগঃ</u> ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ৬০ বছর পুর্তি হলো। **''স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা''** এই মূলমন্ত্র কে সামনে রেখে ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভ্যাট), ওয়াস, কৃষি, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুকি হ্রাস নিয়ে বাংলাদেশের ৩৮ টি জেলায় কাজ করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচি অন্যতম। **এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা -৩ এর আওতায় কমবেশি প্রতিটি টার্গেট এর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।**

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৯০ সালে। মাদকবিরোধী সচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুরু হলেও এর ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকার অদুরে গাজীপুরে ৫ বিঘা জায়গার উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রথম চিকিৎসা কেন্দ্র। ২০১০ সাল থেকে যশোরে মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ২০১৪ সালে থেকে ঢাকাতে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। চিকিৎসা কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৭ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কার্যক্রমের অবদান স্বরূপ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক বিরোধী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের জন্য একাধিকবার পুরস্কার অর্জন করেছে। মিশনের মাদক বিরোধী কার্যক্রম এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করছে এবং বিদেশী মাদক বিরোধী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

**মাদক নিয়ন্ত্রণ এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কেন অপরিহা এবং করনীয়ঃ** বিশ্বনেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজির) ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৬৯টি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান অন্যতম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাদক বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে তথাপি এসডিজির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে এখনো সংশোধন করা হয়নি। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, চিকিৎসা কার্যক্রম মাদকদ্রব্যের চোরাচালান বন্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলো যুগোপযোগি করার দাবি রাখে। বিদ্যমান আইনের দূর্বল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে অনেক পিছিয়ে রাখবে। কারণ, কার্যকর মাদক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা 'স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণ এবং সব বয়সের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা' সম্ভব নয়। আর এসডিজি'র অন্যান্য লক্ষমাত্রা (১৭টি) অর্জনে মাদক একটা বড়ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও এছাড়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাদক একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তাই মাদকের এই ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন পর্যয়ে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলো-

**মাদকদ্রব্যের সরবরাহ কমানোঃ** মাদকদ্রব্যের সরবরাহ সাধারণত চোরাচালানীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মাদকদ্রব্য সরবরাহ সীমিত করতে আইন শৃংখলায় নিয়োজিত বাহিনী এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিজেবি, পুলিশ, র‍্যাব, কোস্ট গার্ডসহ

অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে স্থানীয় পর্যায়ে এলাকা ভিত্তিক মাদকদ্রব্য সরবরাহকারীদেরকে চিহ্নিত করে জনসাধারণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে এবং সরবরাহকারীদেরকে নির্মূল করার উদ্যোগ নিতে হবে।

**মাদকদ্রব্যের জন্য চাহিদা কমানো:** দেখা যায় একজন মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীর দেখাদেখি তার বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী আত্নীয়-স্বজন অনেকে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সে কারণে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের বন্ধু বান্ধবদেরকে মাদকদ্রব্যে ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ, হাট-বাজার এবং যেখানে জনসমাগম হয়ে থাকে সে সব এলাকায় ব্যাপক জন সচেনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে র‍্যালি, আলোচনা সভা পোষ্টার প্রদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা হ্রাস কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

**ক্ষতিহ্রাস/ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন:** মাদক নির্ভরশীলতাকে বলা হয় একটি জটিল পুনঃ আসক্তিমূলক মস্তিস্কের রোগ বা এ ক্রনিক রিল্যাপ্সিং ব্রেইন ডিজিজ। একজন মাদক নির্ভরশীলকে মাদকমুক্ত করতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা। কারণ একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘদিন মাদক গ্রহনের কারণে অনেকেরই আচরণ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে থাকে বিধায় তাকে মাদকমুক্ত থাকতে হলে আচরণ ও চিন্তা- চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। আচরন পরিবর্তন একটি কষ্টসাধ্য বিষয় হলেও মাদকমুক্ত থাকার সাথে আচরণ পরিবর্তন গভীর ভাবে জড়িত।

চিকিৎসার পাশাপাশি যারা চিকিৎসা নিতে আগ্রহী নয় বা সামর্থ নেই তাদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ভাবে ক্ষতিহ্রাস/ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেমন: আবাসিক চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে মেথাডন ক্লিনিক স্থাপন, এইচআইভির জন্য ঝুকিপূর্ণদের জন্য সূঁই সিরিঞ্জ বিতরন কর্মসূচি, ওভারডোজ নিয়ন্ত্রণ মূলক শিক্ষা প্রদান, এইচআইভি ও হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মাদক বিরোধী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।

কাজেই এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষমাত্রা অর্জনে বিদ্যমান আইনের পর্যলোচনা ও দীর্ঘমেয়াদি মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। যার লক্ষ্য হবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুসারে **''দেশ থেকে যেভাবে জঙ্গিবাদ দূর করা হয়েছে একইভাবে মাদকও সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে-----আমরা প্রত্যেক ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখতে চাই। কেন আমাদের ছেলেমেয়েরা বিপথে যাবে? যখন পরিবারের একজন সদস্য মাদকাসক্ত হয় তখন পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়"**। সমাজের অস্থির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা বিপদগুলোর দিকে নজর রাখা এবং সচেতনভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ আজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নাহলে আরও বেশি সংখ্যক তরুন-তরুনী মাদক গ্রহণ করবে। ঝুঁকিপূর্ণ হবে তাদের প্রাণোজ্জ্বল বর্তমান এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। সামাজিক মানুষ হিসেবে আমরা এগিয়ে আসতে পারি এই সমস্য মোকাবেলায়। সামাজিক সচেতনতা তৈরী ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন করা এবং সরকারী পৃষ্টপোষকতা এই সকল ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাম্য। দেশে কার্যকর ভাবে মাদক নিয়ন্ত্রিত হোক, দেশ সমৃদ্ধি অর্জন করুক। তাহলে এ উদ্যোগ এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আসুন আমরা দেশের ভবিষ্যত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করি।

প্রবন্ধ উপস্থাপক:

**ইকবাল মাসুদ**
প্রধান, স্বাস্থ্য সেক্টর
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং
সাধারণ সম্পাদক
সংযোগ- মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক
গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার, দ্যা কলম্বো প্লান